পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে শিক্ষা কমিশন

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে পাঁচ দিনব্যাপী করাচিতে পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পাকিস্তানের শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড গঠনসহ পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে স্কুল ও কলেজে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়। পাঁচ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা, শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সামরিক প্রশিক্ষণ, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠন, কারিগরি শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠান ও নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তান আমলে যে সকল শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল এবং পাকিস্তানের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কাজ করেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ক) মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ শিক্ষা কমিশন

১৯৪৯ সালে ১৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ কে 'পূর্ব বঙ্গশিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন' নামে পরিচিত কমিটির প্রধান নিয়োগ করা হয়। এই কমিটি ১৯৫২ সালে তার সুপারিশমালা তদানীন্তন সরকারের নিকট পেশ করে। এই সব সুপারিশ প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, নারী, সংখ্যালঘু শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল।

খ) আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন

১৯৫৭ সালের ৩ জানুয়ারি। একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের চেয়ারম্যান হন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান। এই কমিশন মূলত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ দানের জন্য গঠন করা হয়। এই কমিশনের প্রথম সভা ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই কমিশন সুপারিশ প্রণয়নের পূর্বে ব্রিটিশ আমলের সকল সুপারিশ পর্যালোচনা করে। তাছাড়া এ কমিশন ১৯৫২ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, শিক্ষকদের গুণগতমান ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকার তা বাস্তবায়ন করেনি।

গ) শরীফ ও হামিদুর রহমান কমিশন

পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর তদানিন্তন পাকিস্তান সরকার জাতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করে। ১৯৫৯ সালের ৫ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কমিশন উদ্বোবন করেন। এই শিক্ষা কমিশনের প্রধান ছিলেন পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব এসএম শরীফ। তার নামানুসারে এ কমিশনের নাম রাখা হয় শরীফ কমিশন। এ কমিশন পূর্বের কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশ পর্যালোচনা করে কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রকৃত পক্ষে পাকিস্তানের শিক্ষা সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য প্রথম কমিশন হচ্ছে শরীফ শিক্ষা কমিশন। এ কমিশন ১৯৫৯ সালের আগস্টে রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ শেষ করে ১৯৬০ সালে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে। তাছাড়া, হামিদুর রহমান কমিশন আইয়ুব খানের আমলে গঠিত হয়েছিল। শরীফ কমিশনের দায়িত্ব ছিল জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ন করা। আর হামিদুর রহমান কমিশনের দায়িত্ব ছিল ছাত্রছাত্রীদের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে তা দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা এবং ছাত্রদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনার সুপারিশ করা।

বাংলাদেশ আমলে শিক্ষা কমিশন (১৯৭১-২০১০)

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের করার জন্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত-এ-খুদাকে প্রধান করে বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এর আগে প্রায় দু'শ বছর ব্রিটিশ শাসন, চব্বিশ বছর পাকিস্তানী শাসক ও বৈষম্যমূলক শিক্ষা পরিকল্পনা, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নিয়ে এদেশের শিক্ষা যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধানে 'সকল শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা' প্রদানের জন্য একই মানসম্পন্ন' গণমুখী এবং সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ঘোষণা দেয়া হয়।

১) কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে ২৪ অক্টোবর কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলাই ছিল এ কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কুদরাত-এ-খুদাকে প্রধান করে ১৮ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সমন্বয়ে এ কমিশন গঠন করা হয়। শিক্ষার নানাবিধ অভাব ও ত্রুটি বিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশ দান এবং দেশকে কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যেই সরকার এই কমিশন গঠন করে। ১৯৭৩ সালে ৩ জুন কমিশন তার অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করে। প্রায় ৪০০ জন সদস্যসম্বলিত ৩০টি অনুধ্যান কমিটি ও বিশেষ কমিটির বিস্তৃত কাজের মাধ্যমে এই কমিশন শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করে। ১৯৭৪ সালের ৩০ মে কমিশন ৩৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত ৪৩০ পৃষ্ঠার একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে। এটা একটি মূল্যবান শিক্ষা দলিল হিসেবে বিবেচিত। এতে বাংলাদেশের শিক্ষার বাস্তব সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ সকল সমস্যার সমাধানের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। এতে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষায় অর্থ সংস্থানের কথা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ উৎসের সন্ধানের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর এই শিক্ষা দলিলটিকে জনগণের মধ্যে আর প্রচার করা হয় নি।

২) অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা কমিশন (১৯৭৯)

১৯৭৮ সালে ৫ আগস্ট এক সরকারি আদেশ বলে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩২ সদস্যবিশিষ্ট এক জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। পরে ২৩ সেপ্টেম্বর অন্য এক আদেশ বলে আরও ৯ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পরিষদ গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দু'টি- ক) একটি অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নে সরকারকে সাহায্য করা খ) শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্মুখীন সমস্যাবলী সম্পর্কে সাধারণভাবে সরকারকে অবহিত রাখা। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আ. ম. শরফুদ্দিন পরিষদ সচিবালয়ে প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করেন। উক্ত পরিষদ দীর্ঘ ছয় মাস অক্লান্ত পরিশ্রম ১৯৭৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে।

৩) মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশন (১৯৮৮)

১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে। কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন ড. মফিজ উদ্দিন। মূল কমিটি ছিল ২৭ সদস্যবিশিষ্ট। ৩০০ জন সদস্যবিশিষ্ট ৩০টি অনুধ্যান ও বিশেষ কমিটির মাধ্যমে কমিশন তার কাজ করে। কমিটির ওপর অর্পিত দায়িত্ব ছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা ও বিরাজমান পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক মাদ্রাসা, কারিগরি, প্রকৌশল এবং চিকিৎসাসহ সকল স্তরের শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন করে সরকারের নিকট উপস্থাপন করা। মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল স্তরের সমস্যাবলী চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ১৯৮৮ সালে রিপোর্ট প্রকাশ করে।

৪) জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (১৯৯৭)

১৯৯৭ সালের ১৪ জানুয়ারি সরকারের এক নির্বাহী আদেশ বলে সাবেক উপদেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এম. শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ৫৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭৪ সালের কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের আলোকে এবং অন্যান্য কমিশনের সুপারিশগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে দীর্ঘ সময়ব্যাপী কাজ করে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতির দলিল সরকারের নিকট পেশ করে। এটি জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৯৭ নামে পরিচিত। এতে শিক্ষার ১৪টি জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এই শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক থেকে শুরু করে শিক্ষার সকল স্তরের সমস্যাবলী আলোচনা করে আধুনিক বাস্তবসম্মত বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকাশিত এই শিক্ষা নীতিতে ২৫টি মূল অধ্যায় ও পরিশিষ্ট অংশে পাঁচটি উপাংশ রয়েছে।

৫) জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ শিক্ষামন্ত্রণালয়ের এক নির্বাহী আদেশ বলে ৬ এপ্রিল ২০০৯ সালে বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে গঠন করা হয়। কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহম্মদ ও সদস্য সচিব করা হয় অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবিরকে। উক্ত শিক্ষা নীতিতে সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৮ এবং দুটি সংযোজনীসহ আটাশটি অধ্যায় ও ত্রিশটি শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বিদ্যমান আছে। শিক্ষার প্রত্যেকটি স্তর নিখুঁতভাবে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের পথ বের করা হয়েছে। এই শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এখানে ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আঠার সদস্যবিশিষ্ট্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি মাত্র চার মাসের মধ্যে একটি বসড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার পর তা চূড়ান্ত না করে ব্যাপক জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হলে সকল মহলের বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা সভা করে সমাজের সকল স্তরের মানুষের দলমত নির্বিশেষে মতামত নেয়া হয়। এই শিক্ষানীতি সম্পর্কে দুটি বিষয় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। ১) এটা কোন দলীয় শিক্ষা নীতি নয়, জনগণ তথা জাতির আকাংখা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে তৈরি করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি। ২) শিক্ষানীতি কোনো অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়। এর পরিবর্তন ও উন্নয়নের পথ সব সময় উন্মুক্ত থাকবে। কোনো ভুলত্রুটি হলে তা সব সংশোধন করা যাবে। শিক্ষা একটি গতিশীল বিষয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নয়নের সঙ্গে সংগতি রেখে সব সময় এর পরিবর্তন, বা আধুনিকরণ অব্যাহত থাকবে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট নির্দেশসমূহ বিবেচনা রাখা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশনে প্রত্যেক সদস্য দেশে সকল শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার তাগিদ রয়েছে। সেটিও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত বিজ্ঞান মনস্ক এবং মানসম্মত শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে গণ্য করবে।

উপসংহার

ব্রিটিশ ভারত থেকে শুরু করে পাক বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত যতগুলো শিক্ষা কমিশন বা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে সবগুলো কমিশন শিক্ষার উন্নতি, শিক্ষক শিক্ষার্থী সমস্যার এবং তার সমাধান, নারী-শিক্ষার উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা প্রভৃতির ব্যাপারে কিভাবে উন্নয়ন করা যায় তার বিস্তারিত সুপারিশ প্রদান করেছে। ব্রিটিশ আমলে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিটিশদের চিন্তা, চেতনা এবং তাদের স্বার্থ আগে হাসিল করা। ভারতীয়দের উন্নয়ন এখানে মুখ্য ব্যাপার ছিল না। তবে প্রত্যেক শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছে। এ শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক সরকারিকরণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। তবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে কিনা তার কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। শিক্ষার ইতিহাস থেকে জানা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষাকে শুরু থেকেই বেসরকারিকরণের সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষা বিস্তারে প্রত্যেকটি শিক্ষা কমিশন যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তেমনি প্রত্যেকটি শিক্ষা কমিশনের আলাদা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে, যার জন্য সে সকল কমিশনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সর্বজনবিদিত। ব্রিটিশ শিক্ষা কমিশনগুলো শিক্ষার বীজ বপন করে দিয়েছে আর পাক- বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশনগুলো সেই বীজ থেকে ফল সংগ্রহ করে জনগণের নিকট পৌছে দিয়েছে। তবে বাংলাদেশ আমলে যত শিক্ষা কমিশন করা হয়েছে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। সর্ব শেষ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ একটি যুগান্তরকারী পদক্ষেপ। এই শিক্ষানীতি সকল সুপারিশ বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মতো হবে বলে আশা করা যায়।

লেখক : শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

প্রত্যেক শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছে। এ শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক সরকারিকরণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। তবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে কিনা তার কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। শিক্ষার ইতিহাস থেকে জানা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষাকে শুরু থেকেই বেসরকারিকরণের সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষা বিস্তারে প্রত্যেকটি শিক্ষা কমিশন যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তেমনি প্রত্যেকটি শিক্ষা কমিশনের আলাদা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে, যার জন্য সে সকল কমিশনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সর্বজনবিদিত। ব্রিটিশ শিক্ষা কমিশনগুলো শিক্ষার বীজ বপন করে দিয়েছে আর পাক- বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশনগুলো সেই বীজ থেকে ফল সংগ্রহ করে জনগণের নিকট পৌছে দিয়েছে।

05 FEB 2015